ছোটো সবুজ মানুষ

ইমদাদুল হক মিলন

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ফেউ	৯
পরির বয়স চারশো বছর	৩৩
ছোটো সবুজ মানুষ	৫৩
সাপ আসে	৭৩
নিঝুম দ্বীপের সেই ছেলেটি	৮১
চিতা রহস্য	৯১
ক্লাসের সবচাইতে দুষ্টু ছেলেটি	১১৮
আয়নাপড়া	১৩৪
দুইজন সেকান্দার ভাই	১৫৬
পাখিটি	১৬২
ফার্স্টবয় সেকেন্ডবয়	১৭৭
চালাক বানর বিপদে পড়েছিল	২০৩
ডাকাতরাও মানুষ	২১৩

ফেউ

রাত দুপুরে ফেউ ফেউ শব্দে কী একটা জন্তু ডাকাডাকি করছে। কয়েকদিন ধরে শুরু হয়েছে এই কাণ্ড। গ্রামের লোকজন আগে কখনও এ রকম ডাক শোনেনি। তারা চিন্তিত। এই চিন্তা বেড়ে গেল যেদিন মতলেবের একটা ছাগলছানা বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। পরদিন ছানাটির ছেঁড়াখোঁড়া চামড়া আর হাড়গোড় পাওয়া গেল মাঠের ধারে।

এই গ্রামের নাম হিজলিয়া। অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায় হিজলিয়া হচ্ছে তেমন গ্রাম। ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরা। ফসলের মাঠ আছে বিস্তর। গরিব গৃহস্থ লোকের বাস। চাষি মজুর জেলে, কয়েকঘর তাঁতি, চায়ের দোকানদার মুদি দোকানদার এ রকম লোকজনই বেশি। একটা প্রাইমারি স্কুল আছে গ্রামে। হাইস্কুল আছে তিন কিলোমিটার দূরে। প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে কেউ কেউ হাইস্কুলেও যাচ্ছে আজকাল। এমনকি মেয়েরাও যাচ্ছে। ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো ঢুকছে গ্রামে।

আগে এই অবস্থাটা ছিল না। ক্বচিত একটু স্বচ্ছল পরিবারের কেউ কেউ হাইস্কুল পর্যন্ত যেত। ম্যাট্রিক পাস করে আইএ বিএ পড়তে কলেজে যেত। গ্রামের প্রথম বিএ পাস করা লোক সরকার বাড়ির মালেক সরকার। বিএ পাস করে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। ওসি হয়েছিলেন। কয়েক বছর আগে রিটায়ার করে গ্রামে বসবাস করছেন। ওসি সাহেবকে ওসি সাহেব বলেই ডাকা উচিত কিন্তু গ্রামের লোকে সে নামে ডাকে না। ডাকে 'দারোগা'। নামের সঙ্গে দারোগা লাগিয়ে ডাকে 'মালেক দারোগা'। আড়ালে আবডালে শুধু দারোগাও বলে, শুধু সাহেবও বলে। সাহেবটা সামনাসামনিও বলে।

মালেক দারোগার বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই। তিনি নিঃসন্তান তবে জাঁদরেল লোক। দেখতে যেমন দশাসই, তেমনি প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, প্রতাপশালি। তাঁর হাকডাকে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। গ্রামের শেষ প্রান্তে বিশাল বাড়ি। বড়ো বড়ো কয়েকটা ঘর, ফল ফলারির বাগান, বাঁশঝাড়। বাড়ির লাগোয়া মাঠে অনেক জমি। বছরভর সেখানে ফসল ফলছে। কাজের লোকজন আছে বেশ কয়েকজন। পরিবার পরিজন নিয়েই তারা বংশ পরম্পরায় এই বাড়িতে থাকছে। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার তদারক করেন মালেক দারোগা স্বয়ং। চারপাঁচ বছর বয়স হলেই প্রাইমারি

স্কুলে পাঠাচ্ছেন। প্রাইমারি শেষ হলে হাইস্কুলে পাঠাচ্ছেন। পড়াশোনার ব্যাপারে কেউ তেড়িবেড়ি করলে তার বিপদ আছে।

শুধু যে দারোগা-বাড়ির ছেলেমেয়েদের ব্যাপারেই এ রকম শাসনজারি করেছেন মালেক দারোগা তা না, রিটায়ারমেন্টের পর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করে গ্রামের প্রতিটি বাড়ির ছেলেমেয়েরেই পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁজখবর করছেন। পুলিশি একটা লাঠি সব সময়ই হাতে আছে তাঁর। মোটা বেতের, তেল চকচকে লাঠি। দু'মাথায় পিতলের ক্যাপ বসানো, হাত দু'য়েক লম্বা। ওই জিনিস হাতে নিয়ে সকাল বিকাল গ্রামে চক্কর খান। কোন বাড়ির ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না, পড়াশোনা করছে না খোঁজখবর করেন। ওসি থাকা অবস্থায় চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাসদের এই লাঠি দিয়ে বেদম পিটিয়ে যেমন শায়েস্তা করতেন, নিজ গ্রামের শিশুকিশোর ছেলেমেয়েদের ওপর তো আর তা প্রয়োগ করতে পারেন না, তবে ভয় দেখান। কী রে, মার খাবি না পড়বি? পিটানি দেব, না স্কুলে যাবি?

মালেক দারোগা ছয়ফুটের মতো লম্বা। গায়ের রং ঝিম কালো। অতিকায় দেহ। পা দু'খানা কলাগাছের মতো, হাত হচ্ছে গিয়ে ওই কলাগাছের মতোই, তবে প্রাপ্তবয়স্ক কলাগাছের মতো না, কিশোর কলাগাছ। চোখ ভাঁটার মতো। থ্যাবড়া নাকের তলায় ছাগলছানার লেজের মতো গোঁফ। মাথাভরতি টাক। যেমন বিশাল বপু তেমন গলার আওয়াজ। ধমক ধামক তো দূরের কথা, মালেক দারোগা কথা বললেই পিলে চমকে যায় লোকের। বাড়ির ছোটো বাচ্চাকাচ্চা বেশি বিরক্ত করলে মালেক দারোগার কথা বলে তাকে ভয় দেখানো হয়। 'ওই যে মালেক দারোগা আইলো'...সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চারা ঠাণ্ডা। দূর থেকে মালেক দারোগাকে দেখলে, এমনকি তার ছায়া দেখলেও শিশু কিশোরের দল পিঠটান দেয়।

ছোটোরা যেমন ভয় পায় মালেক দারোগাকে, বড়োরা তেমন সমীহ করে, মান্য করে। যে কোনো বিপদআপদে গ্রামের লোকের একমাত্র ভরসার জায়গা মালেক দারোগা। সাহায্য সহযোগিতা বুদ্ধি পরামর্শ যখন যা লাগে, জায়গা ওই একটাই। মালেক দারোগা বা দারোগা বা সাহেব।

তবে মনের দিক দিয়ে মালেক দারোগা অসাধারণ। শরীর যেমন দশাসই মনও তেমন। দরাজ দিল বলতে যা বোঝায় তাই। মানুষের বিপদআপদে তার পাশে আছেন। কথা বলবেন ধমক দিয়ে কিন্তু কাজটা করবেন। যেমন কারও হয়তো টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। সাহায্যের জন্য এল দারোগার কাছে। বিনীত গলায় ডাকল, 'দারোগা সাহেব...।'

মালেক দারোগার প্রিয় পানীয় আদা চা। আদাকে তিনি আদর করে বলেন 'আদ্রক'।

সঙ্গে চা যুক্ত হলে হয় ‘আদ্রক চা’। তিনি হয়তো তখন বিশাল মগে তাঁর ওই ‘আদ্রক চা’ পান করছেন। ধমক দিয়ে উঠলেন। ‘কী? চাস কী?’

‘আমার মেয়েটা সাহেব...।’

‘কী হয়েছে তোর মেয়ের?’

‘বড়ো হয়ে গেছে সাহেব...।’

‘বিয়ে দিসনি?’

‘না সাহেব। কীভাবে দেব... মানে...।’

‘এত মানে মানে করছিস কেন? একটা থাপ্পড়ে মুখের বত্রিশটা দাঁত ফেলে দেব ফাজিল কোথাকার।’

‘মুখে বত্রিশটা দাঁত বোধ হয় নাই সাহেব। দুই চারটা পড়ে গেছে। তবে যে কয়টা আছে সেই কয়টা ফেলে দেন। তার পরও মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাটা করেন।’

ব্যবস্থা মালেক দারোগা করে দেন। এক কথায় তিনি হচ্ছেন গ্রামপ্রধান। তাঁকে না জানিয়ে গ্রামের কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না। অচেনা জন্তুটার ফেউ ফেউ ডাকের কথাও তাঁকে জানানো হল। তবে জানানো হল তিনটা ঘটনা ঘটার পর।

মতলেবের ছাগলছানার ঘটনার তিনদিন পর খবিরের সাদা গোরুর পাঁচদিন বয়সি বাছুরটার হল একই দশা। তার পর গেল দেলোয়ার মুন্সির বড়ো একটা রাজহাঁস।

না আর তো বসে থাকা যায় না! দারোগার কাছে যেতে হয়!

এক বিকেলে গ্রামের লোকজন এল দারোগা বাড়িতে। দুপুরে ভাত খেয়ে ঘণ্টা দেড়েকের একটা ঘুম দেন সাহেব। উঠে তাঁর ওই বিশাল মগ ভরতি করে আদ্রক চা নিয়ে বসেন। সেটি গলধ:করণ করে, বেতের ওই লাঠি হাতে গ্রামে চক্কর খেতে বেরোন। পরনে আলখাল্লার মতো সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। পায়ে নরম ধরনের পাম্পশু। সেটি ধারণ করে আছে তাঁর গাত্রবর্ণ।

মালেক দারোগার বসার চেয়ারটা নিখিল মিস্ত্রি কয়েক বছর আগে বানিয়ে দিয়েছে। হাতলঅলা অতিকায় চেয়ার। মাঝারি মাপের তিনজন মানুষ ওই চেয়ারে পাশাপাশি বসতে পারবে। এ রকম চেয়ার কিনতে পাওয়া যায় না। বানিয়ে নিতে হয়। তবে চেয়ারটা মালেক দারোগার একেবারে সাইজ মতো হয়েছে। তিনি সেই চেয়ারে সমাসীন। ঘুম ভাঙার আগেই তাঁর সর্বক্ষণের সহচর মোবারক আর তালেব দু’জনে ধরে চেয়ারটা উঠানের কোণে এনে রেখেছে। ওই জিনিস তো একা বহন করা সম্ভব না। দু’জনের আনতেই জান বেরিয়ে যায়।

যা হোক বিকালের চা তিনি ওখানে বসেই পান করেন। লোকজন দেখে স্বভাবসুলভ ধমকের গলায় বললেন, ‘কী? ঘটনা কী? বিরাট বহর দেখছি?’

গ্রামের মাতব্বর হচ্ছে মজিদ দেওয়ান। সে কাঁচুমাঁচু গলায় বলল, ‘ঘটনা জটিল দারোগা সাহেব।’

‘তা আমি বুঝেছি। জটিল না হলে তোরা সবাই দল পাকিয়ে আমার কাছে আসতিস না। হয়েছি কী? বল বল, ঘটনা বল।’

‘গ্রামে অচেনা একখান জন্তুর উৎপাত শুরু হয়েছে।’

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলেন দারোগা। ‘অচেনা জন্তু? উৎপাত্? বলিস কী?’

তাঁতিপাড়ার বিপিন দারোগা সাহেবকে বলে ‘কর্তা’। সে দু’হাত লেবুর মতো কচলাতে কচলাতে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা। মতালেবের ছাগলছানা খেয়েছে, দবিরের সাদা গোরুর পাঁচদিন বয়সি বকনাটা খেয়েছে আর খেয়েছে দেলোয়ার মুন্সির পালেরগোদা রাজহাঁসটা।’

কাশেম মোল্লা বলল, ‘রাত দুপুরে ফেউ ফেউ করে ডাকে।’

কাশেম কথা বলে অভিনয়ের ঢংয়ে। যে কোনো প্রাণির ডাক নকল করতে পারে। মানুষের হাঁটাচলা কথা বলার ধরন নকল করতে পারে। লোক হাসাবার ওস্তাদ। তার এই গুণের কথা দারোগাও জানেন। বললেন, ‘ডাকটা শোনা তো!’

সঙ্গে সঙ্গে আহলাদে আটখানা হয়ে ঠোঁট সরু করে ‘ফেউ ফেউ’ করে বার কয়েক ডাকল কাশেম। শুনে লোকজন হেসে ফেলল। দারোগা গম্ভীর। ‘হাসবি না, হাসবি না। চিন্তার কথা।’

খেয়াঘাটের মাঝি লোকটার নাম উজির। সে বলল, ‘গ্রামের সকলেই ডাকটা দু’চারবার শুনেছে। আপনি শোনেননি সাহেব? ওই কাশেম যেমন করে শোনাল ঠিক অমন করেই ডাকে।’

দারোগা চায়ে চুমুক দিলেন। ‘আমি কী করে শুনব বল? রাত দুপুরে আমার কী অন্যের ডাক শোনার সময় আছে? নিজের নাক ডাকাবার ব্যাপক শব্দটাই পাই না তো ‘ফেউ’ ডাক! ওসব তো আমার নাকডাকার কাছে কী বলে, নস্যি নস্যি।’

দারোগা বাড়ির অদূরে আবুল বেপারির বাড়ি। সে বলল, ‘আপনার নাকখান ডাকে বটে সাহেব। বিপুল ডাকা ডাকে। আমরা বাড়ি থেকে পরিষ্কার শুনতে পাই। ঠিকই বলেছেন সাহেব। ওরকম ডাকের কাছে বাঘের গর্জনও নস্যি।’

‘ঠিক বলেছিস। একদম ঠিক। ঠা ঠা ঠা, ঠা ঠা ঠা...।’

মালেক দারোগার হাসিতে এই বিকেলে পুরো হিজলিয়া গ্রামখানায় বেদম একখানা কম্পন লাগল। যেন মৃদু ভূমিকম্প হয়ে গেল। তবে হাসিটা তিনি মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। তাঁর প্রিয় আদ্রক চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন। চিন্তিত হলেন। জলদগম্ভীর গলায় ডাকলেন, ‘আবুল।’

‘জি সাহেব।’

‘তুই কী বললি? আমার নাকডাকার কাছে বাঘের গর্জনও নস্যি?’

আবুল ভয় পেয়ে গেল। সাহেব কি মাইন্ড করলেন? সর্বনাশ! তা হলে তো মহাবিপদ। এখনই না এত লোকের সামনে বলেন, এক থাপ্পড়ে তোর বত্রিশটা দাঁত আমি ফেলে দেব, ফাজিল কোথাকার! আবার কান ধরে ওঠবসও করাতে পারেন। ভারি একটা বেকায়দায় পড়ে গেল আবুল। কী করবে বুঝতে পারল না। মিথ্যা বলবে? না না আমি তো বলিনি সাহেব! আমি বলেছি...।

মিথ্যাটা কী বলবে তাও খুঁজে পেল না আবুল, এতটাই দিশাহারা। তখন ভাবল আচমকা একটা দৌড় দিয়ে দারোগা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। পরে যা হবার হবে। তক্কে তক্কে থাকবে কখন দারোগার ছায়া দেখা যায়। দেখলেই যেদিকে পারে চম্পট দেবে।

কিন্তু মালেক দারোগা কথা বলছেন না। চিন্তিত। আপন মনে ‘বাঘ’ শব্দটা দু’তিনবার উচ্চারণ করলেন। বাঘ বাঘ...। তার পরই যেন কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন এমন গলায় বললেন, ‘ফেউ ফেউ করে ডাকে... ফেউ ফেউ...।’

কাশেমের মিথ্যা বলা আর দৌড় দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। সে বুঝে ফেলেছে সাহেব আর কাশেমের কথার মধ্যে নেই। অন্য চিন্তায় ডুবে গেছেন। যাক বিরাট বাঁচা কাশেম বেঁচে গেল। গ্রামের সবচাইতে বয়স্কলোক হচ্ছে মমিন খাঁ। দারোগা তার দিকে তাকালেন। মমিন খাঁকে তিনি ডাকেন ‘মামু’। এখনও সেই ডাকটা ডাকলেন। মামু।

মমিন খাঁ লাঠি ভর দিয়ে উঠোনের মাটিতে পিছন না ঠেকিয়ে বসে আছে। সেই অবস্থায় সাড়া দিল। ‘জে সাহেব।’

‘ফেউ নামে যে একটা জন্তু আছে...।’

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই মমিন খাঁ বলল, ‘জে সাহেব আছে। বাঘের সঙ্গে থাকে। বাঘের সঙ্গে ‘ফেউ’ বলে একটা কথা আছে না? এইজন্য গ্রামের লোকে চামচাদের বলে ‘ফেউ’। অর্থাত্...!’

‘অর্থ বলতে হবে না। চামচা অর্থ সবাই জানে। মোসায়েব, তাবেদার, তৈলবাজ। কিন্তু ঘটনা তো ভয়াবহ। বাঘের সঙ্গে ‘ফেউ’। অর্থাৎ গ্রামে একখানা বাঘের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার সঙ্গে আছে ‘ফেউ’। বাঘ নিজে ডাকাডাকি করছে না, ডাকছে ‘ফেউ’ আর ছাগল বাছুর রাজহাঁস ধরে খাচ্ছে ব্যাঘ্র।’

গ্রামে বাঘ এসেছে শুনে লোকজন এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ভয়ে আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে সবার। অনেকের গলা শুকিয়ে গেছে। তারা ঘট ঘট শব্দে